বিশ্বায়নের যুগে জঙ্গলের বিনোদনের রূপরেখা

ড. প্রভাতকুমার সরকার

বিশ্বায়নের যুগে জঙ্গল সমাজের বিনোদনের মূল্যায়ন চিন্তা করেছিলাম। জঙ্গলের আদিবাসী সমাজের সঙ্গে শৈশব হতে আমার একটা অবিচ্ছেদ্য মানসিক সম্পর্ক পড়ে আছে। ফলে আমার জীবনের চলমান গতির পর্যায়ে সব সময় এই সমাজ জীবনের তুলনা আমার কেন যেন, অথবা বলা চলে অকারণে আমার মনে এসে পড়ে।

আজকের যুগে প্রচারমাধ্যম বা মিডিয়া সব থেকে শক্তিমান বস্তুরূপে তৈরি হয়েছে। এর অসীম ক্ষমতায় আজ সবকিছু সকলের নাগালের বস্তু হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর পরিধি হয়ে গিয়েছে ছোট, দূরকে নিকট করেছে, পরকে করেছে আপন। তারজন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক পণ্যের স্তরে উপনীত হতে পেরেছে। এই পর্যায়ে দেখতে পাই আজ হোটেল ব্যবসাও সমস্তরে এসে পড়েছে। আজকের হোটেলগুলিতে দেখা যায় মনোরঞ্জনের জন্য এরা যে কোন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে খদ্দেরদের বিনোদন করতে কত কী ব্যবস্থায় আয়োজন করে। মনে হয় তাদের কাজে আজকের গোল ধরিত্রী যেন সমতল হয়ে গিয়েছে। তেমনই এরা যেন পৃথিবীর সব ইতিহাসের পাতাকে খরিদ্দারের চোখের সামনে উন্মুক্ত করে রেখে দর্শকদের তা চিনিয়ে দিচ্ছে। উদাহরণ দিলে এই বক্তব্যটা সুস্পষ্ট হবে।

আমার আলোচনার পরিধি কেবল ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যদিও আজ ভারতবর্ষও এই সব আয়োজন হতে কোনও রকমে পিছিয়ে পড়ে নেই। যাই হোক, প্রশান্ত মহাসাগরে বিপুল পরিবেশে ম্যানিলা শহর, প্রায় সব ভ্রমণকারীর যেমন নজর কাড়ে তেমনই ব্যবসার ক্ষেত্রেও এর সুনাম আছে। শহর থেকে ১২৫ কিমি দূরে ‘টাগাইটাই’ স্থানটি ভ্রমণ - বিলাসীদের একান্ত প্রিয় স্থান। আমি স্থানটির মাহাত্ম্য না জেনেই কোন এক প্রয়োজন একবার এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম।

বাস-স্টপেজের পাশেই বিশাল এলাকা নিয়ে এক বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল। একজন আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদের খোঁজে সেখানে আমি গিয়েছিলাম। গেট দিয়ে ঢোকার পূর্বেই একজন ফিলিপিনো হোটেল কর্মীর কাছে ভদ্রলোকের খোঁজ করতে যে আমাকে একটি বিশাল হলঘরের ভিতর এনে ছেড়ে দিল। সেই হোটেল কর্মীটি আমার কথা কী বুঝেছিল জানি না, কিন্তু আমি যেন হঠাৎ অথৈ সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছি। চারিদিকের টেবিলচেয়ার পূর্ণ করে গ্রাহকগণ যাচ্ছে। তাদের সামনে বড় একটি স্টেজে সজ্জিত ছেলেমেয়েরা লোকনৃত্য নেচে চলেছে। এর মধ্যে ঢুকে আমি হতভম্ব, কোথায় খুঁজে পাব উদ্দিষ্ট অধ্যাপককে? খাওয়ায় ব্যস্ত মানুষদের সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তো তাদের মুখ দেখা সম্ভব নয়। লক্ষ করলাম, যারা খাচ্ছে আর নৃত্যগীতের বিনোদন লক্ষ করছে, তারা মাঝে মাঝে পিছন ফিরে ঘুরে ঘুরে কী যেন দেখছে। প্রথমে ভাবলাম এরা বোধহয় আমাকে দেখছে। তারপর তাদের গন্তব্য দৃষ্টি লক্ষ করে আমি ‘এ্যাবাউট টার্ন’ হয়ে পিছনে ফিরে তাকাই, — আর তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। দূরে সারি সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে, তাদের মাথাগুলির উপর ঘনবদ্ধ ধোঁয়ারাশি ভেদ করে ধমকে ধমকে গাঢ় লাল - হলুদ আগুনের হালকা আকাশের দিকে লেলিহান জিহ্বা বাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। আমি বিস্ময়ে হতবাক, কী অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য! এ যে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি! এদিকে সামনে স্টেজে প্রাচীন ফিলিপাইনের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে লোকনৃত্যেও নর্তক - নর্তকীগণ লাফিয়ে লাফিয়ে যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। অপরূপ এই পরিবেশ ছেড়ে উঠে আসা শক্ত। কিন্তু আমার পেটের ভিতর ছুঁচো - ইঁদুরেরা ডন - বৈঠক লাগিয়ে দিয়েছে তখন। আর এখানকার পরিবেশে আমার পকেটের সম্পত্তি অবলম্বন করে খাওয়ার টেবিলে বসার সাহস হল না, বের হয়ে এলাম। ফেরার পথে গেটে টাঙান একটি বোর্ড দেখলাম। তাতে লেখা ওই এলাকাতে প্রবেশমূল্য পাঁচ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ আমাদের তৎকালীন দেশের দুইশত টাকা।

এর ক-দিন পরে বন্টিক জনগোষ্ঠীর এলাকাতে আমি এলাম। সেখানে দেখেছি সুরেলা গনের সঙ্গে হোটেলের স্টেজে যেমন দেখেছি তেমনই লম্ফ - ঝম্ফ এবং উল্লম্ফনের নৃত্য পরিবেশন করে অতিথি - অভ্যাগতদের মনোরঞ্জন করে এবং নিজেরাও আত্মবিনোদন করে থাকে। এই বন্টিক জনগোষ্ঠী অত্যন্ত সাহসী এবং হিংস্র জাতি এবং স্বভাবে এরা অত্যন্ত যুদ্ধ প্রিয়। যুদ্ধে গিয়ে এরা শত্রুর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে তার চোয়াল কেটে নিয়ে তা দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরে। নাচের সময় এরা এই চোয়ালের মালা গলায় পরে নিজেদের বীরত্বের প্রচার করে থাকে। যার মালাতে যত বেশি মৃত ব্যক্তির চোয়াল থাকে সে তত বড় বীর বলে বিবেচিত হয়। বর্তমান যুগে এই যুদ্ধ - প্রিয় জাতি পূর্বের এই ঘটনাগুলির প্রচার নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করে কেবলমাত্র সকলের মনোরঞ্জনের জন্য।

আজকের যুগে বড় বড় সম্মেলনের, টিভিতে বা এই সকল পাঁচতারা হোটেলগুলিতে বিনোদনের জন্য জাতীয় জীবনের প্রকাশ ও প্রচারার্থে যেসব আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নৃত্য ও গীত অনুষ্ঠান আমারা দেখে থাকি, বাস্তবপক্ষে তারা জঙ্গল পরিবেশে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে আগত কলাকুশলী শিল্পী নন। বিভিন্ন নৃত্যকলা সংগঠনকেন্দ্র বা কলাকেন্দ্রগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শহর ও নগরের অর্থনৈতিক সচ্ছল বা ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের কেরিয়ার গড়তে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করিয়ে নেয়। ফলে প্রায় স্থানে এদের সঙ্গে বাস্তবের যোগ থাকে না। সভ্য জগতের নাগরিকেরা বাস্তব জগৎ ও জীবনের সত্য সন্ধানে অনভিজ্ঞ থাকে। তারা কঠিন সত্যকে (বাস্তবকে) গ্রহণ করা অপেক্ষা কৃত্রিম জাঁকজমকে এবং চমকে বেশি মুগ্ধ হয়। তাদের মন সুন্দর, সুস্বাস্থ্য ও চাকচিক্যে অভ্যস্ত। তাছাড়া চমকের প্রলোভন মানুষের মধ্যে চিরকালের, ফলে জঙ্গলের দরিদ্র, অর্ধনগ্ন, অনাহারী ও অপরিচ্ছন্ন জনজাতিরা প্রকৃতির পরিবেশে, —যেখানে বিজলি বাতির ঔজ্বল্যে রঙের রামধনু প্রকাশ থাকে না, — এবং শিল্পীদের পোশাক পরিচ্ছদে দৈন্য পরিস্ফুট, কিন্তু তাদের মনে আনন্দে এইসব স্বভাবশিল্পীরা সারাদিন কর্মব্যস্ত জীবরে অবসরে ললিত গীতি ও বাদ্যের তালে নৃত্যের ঝঙ্কারে আপন মনের

মাধুর্য ঢেলে দেয়, সেখানে কৃত্রিমতা কোনও জৌলুস না থাকলেও প্রাণের স্পর্শে অপরূপ হয়ে ওঠে। আইল্যাণ্ডের চিয়াংমাই বা জাপানের নাগোইয়ার হোটেলে অথবা বড় বড় সম্মেলনের হলে বহুবার এই ধরনের কার্যক্রম দর্শকদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেখান হয়েছে এবং এইসব প্রকৃতি - সৃষ্টি স্বভাবজাত না হওয়া সত্ত্বেও আমরা দর্শকরা সত্যিই খুবই আনন্দ পেয়েছি।

ভারতেরও সব বড় শহরে বা বিভিন্ন বড় বড় সম্মেলনে অথবা হোটেলে এই ধরনের বহু কার্যক্রম হয়, এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে বেশিরভাগ শিক্ষিত ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা থাকে যারা এইসব প্রমোদ অনুষ্ঠানে নিজেদের অধীত কলার প্রচার করছে যেমন, অন্যদিকে এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রীতিমত রোজগার বা উপার্জন করে থাকে। প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়াগুলিতে কবে কোন অনুষ্ঠান হবে তা আগে থেকেই প্রচার হওয়ার বাড়িতে বসে সর্বসাধারণ এই অনুষ্ঠানগুলি দেখে গভীর আনন্দ প্রকাশ করে। আজকাল আদিবাসী সমাজেও লেখাপড়া শেখার চল হয়েছে খুব। আর শিক্ষার জগতে প্রবেশ করে এই সকল শিক্ষিত আদিবাসী ছেলেমেয়েরা তাদের সমাজের বাইরের জগতে এসে এই অমূল্য সম্পদের খবর পেয়ে যায়, তখন তারা নিজেরা সংগঠন তৈরি করে ভাল উপার্জনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যবসার কারণেই এখানেও জঙ্গলের প্রাকৃতিক বাস্তব পরিবেশ রক্ষা হয় নাা। কারণ টিভি, সিনেমাতে কৃত্রিম চাকচিক্য, জাকজমক বেশি থাকে। আবার মুক্ত আকাশের নিচে জঙ্গল - প্রকৃতির মাঠে - ঘাটে নাচের যে বিশাল পরিধি তাকে, তৈরি স্টেজে তা সম্ভব নয়। সেখানে বাস্তবে প্রকৃত বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে তাতে দৈন্য ফুটে ওঠে। প্রকৃতির মহিমাটুকু অধরাই থেকে যায়। তাই আধুনিক বিশ্ব প্রকৃতির তুলনায় কৃত্রিম মনোরঞ্জন বেশি জনপ্রিয়।

"Survival of the fittest" বিশ্বের প্রাণীজগৎ এই নিয়মের অধীন হওয়া সত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের হোমোসেপিয়ান গোষ্ঠীর মানবসমাজ হতে আজকের মানুষ পর্যন্ত কেবল জীবনধারণকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে পারেনি। প্রাচীন যুগেও তাদের হৃদয় ছিল আনন্দলহরীতে পরিপূর্ণ। প্রায় এক লক্ষ বৎসর পূর্বে ধরিত্রী তুষারে আবৃত ছিল, সেই যুগের মানুষদের গুহাগৃহে বাস করতে হত। তাদের অবসর সময়কে আনন্দে ভরে রাখতে তারা গুহাগাত্রে খোদাই করে তাদের তৎকালীন জীবনযাত্রার ছবি এঁকে রেখেছিল। দক্ষিণ ফ্রান্স বা দক্ষিণ - পূর্ব স্পেনের বহু গুহাতে প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা এদের অঙ্কিত চিত্রের খোঁজ পেয়ে জনসাধারণের সামনে তা প্রকাশ করে চলেছে। Cogul গ্রামের একটি গুহাগাত্রে একটি উৎসবের চিত্র সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে। সেই যুগের এমন বহু আনন্দ উৎসবের চিত্র গুহাচিত্রে অমর হয়ে থাকার জন্য সে যুগের সমাজ - জীবনের কথা আজকের মানুষ জানতে পারছে। এইরূপ হরপ্পা যুগের পাওয়া একটি শিলমোহরে সে যুগের নৃত্য শিল্পের আদর অনুভব করা সম্ভব হয়েছে।

এইসব প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ছেড়ে বর্তমান যুগে ফিরে আসা যাক। আজ আমাদের দেশেও বিজ্ঞান দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই বিজ্ঞানের অগ্রগতি নাগরিক সভ্যতায় যতটা প্রভাব ফেলেছে; আর এই বৃহৎ ভারতের গ্রামগুলি যত বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে; অন্যদিকে ভারতের নিস্তব্ধ - শীতল অরণ্য জগৎ কিন্তু এখনও ততটাই আদিম প্রাচীন এবং অকৃত্রিম রয়ে গেছে। তাল - তমাল - শাল মহুয়ার ছায়াঘন অরণ্য প্রান্তরে আজও প্রাচীন আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় নৃত্য এবং গীতের মাধুর্যে মাতাল হয়ে ওঠে। এই অতি বাস্তব - চিত্র টিভির পর্দায় ফুটে উঠতে পারে না বা কোনও বিলাসবহুল হোটেলের বিনোদন কক্ষে একে দেখা যাবে না, অথবা বড় বড় সম্মেলন কৃত্রিম আলোর ঝর্ণাধারায় স্নাত স্টেজেও একে পাওয়া সম্ভব নয়

কিন্তু আমি এদের দেখেছি; এদের আদিম অকৃত্রিম পরিবেশে সঙ্গে চলেছি। এদের বিনোদনে মাইক লাগে না, বিজলীবাতি বিকৃত বোধ হয়। এরা ভারতের যেসব প্রাচীন জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় আছে, যারা আজও ছোটনাগপুরে (ঝাড়খণ্ডের) জঙ্গলে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে, তাদের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে বীরহোর গোষ্ঠী। এরা এখনও জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। জঙ্গলের ধারে সরকারী জমিতে পাতা দিয়ে তাদের নিজস্ব ঢং-এ ঘর বানিয়ে বাস করে। তবে আজ সরকার থেকে কোথাও কোথাও তাদের ছোট ছোট ঘর করে দেওয়া হলেও মূলত তারা জঙ্গল থেকেই ফলমূল কন্দ সংগ্রহ করে। আলাদা কোনো জীবিকা অর্জনের প্রণালী এদের জানা নেই। তার জন্য তারা শিকার করে। আবার গাছের ছাল, যাকে চপ (Bauhinia Scandens) বলে, তা জঙ্গল থেকে এনে দড়ি তৈরি করে। এরা কেনাবেচা প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞ। বিনিময়ে প্রথায় জঙ্গলজাত দ্রব্যের আদানপ্রদান করে জীবিকা নির্বাহ করে। ১৯৭৩ কি ১৯৭৪ সাল থেকে দীর্ঘ ১৯৯২ সাল পর্যন্ত আমি এদের সংস্পর্শে থেকে এদের বিকাশে নিজেকে নিয়োগ করেছিলাম। তখন এদের মধ্যে পাকা বাড়ির ধরণ ছিল না, পাতার ঘরেই বাস করত। আমার শিক্ষিত নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত মন এদের করুণ অবস্থা থেকে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। মনে হত দেরে চেয়ে দুঃখী কেউ নেই। অজ বাষট্টি বছর ভারত স্বাধীন হয়েছে। আজ ভারত অন্য দেশের মতো ধনী দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু এদের সামান্যতম পরিবর্তন বা বিবর্তন হয়নি। এত কথা বলার কারণ আজকের সভ্য স্বাধীন ভারতে এইসব গোষ্ঠীর বিনোদনের কথা বললে হয়তো একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবচিত্র সম্পূর্ণ অন্য রকমের। যাদের দেখে আমাদের করুণায় বুক ফাটে, তাদের মধ্যে দুঃখ বা ক্রন্দন কথাটা ক্ষণিকের।

একটা প্রচলিত কথা আছে যে, যে-বা যারা যত বেশি ভোগী তাদের দুঃখ সহ্য করবার তত কম। তার জন্য আমাদের সমাজে মৃত্যুশোক সহ্য করবার জন্য আমাদের শাস্ত্রে অশৌচ পালনের রীতি আছে। সাধু - সন্ন্যাসী একদিনের শোক পালন করে, যেহেতু আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণরা পূজাপাঠ, বিয়ে - সাদি ইত্যাদির কাজ করে, তাদের অশৌচ এগারো দিনের, আর অন্যান্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা যাদের শূদ্রস্থানীয় আখ্যা দিয়েছে । এদের একমাস বিধান দেওয়া হয়েছে।

জঙ্গলের এই বীরহোর সম্প্রদায় সাধু - সন্ন্যাসীদের পর্যায়ে পড়ে। অনেকবার এদের টান্ডায় অর্থাৎ Settlement-এ গিয়ে কারু না কারুর প্রিয়জনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি হতবাক হয়েছি, কিন্তু বীরহোরদের টান্ডাতে একটা নির্বিকার কর্মব্যস্ত পরিবেশ। তবে সবাই একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই দুই কি তিনদিন পরে সেখানে গিয়ে দেখলাম মৃত্যুর শীতল ছায়া সেখান থেকে সরে

গিয়েছে বাঁচার জন্য কাজে এরা এত ব্যস্ত যে আবেগ নিয়ে বসে থাকার সময় নেই তাদের। তার জন্য বেশিদিন কোনও শোকের ছাপ বা বিকারের স্থান তাদের জীবনে থাকে না।

পর্বতের গুহা থেকে উৎসারিত আনন্দাভিসারী ঝর্ণার উচ্ছল - উদ্বেল তরঙ্গের মতোই এই আদিবাসীদের জীবনধারা। তারা আনন্দের জোয়ারে ভেসে চলা প্রকৃতির সন্তান। বীরহোর সম্প্রদায়ও এদের ব্যতিক্রমী নয়। আদিবাসী জন-সম্প্রদায়ের জীবনধারার নীতিই হচ্ছে প্রকৃতির বুক থেকে যতটা সম্ভব আনন্দ আহরণ করতে পারা ও তাকে প্রকাশ করতে পারা। তাদের এই আনন্দ - বিনোদনকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা সম্ভব। প্রথম, তাদের স্থানীয় উৎসব যা, তারা নিজের নিজের মতো করে পালন করে থাকে সব জঙ্গলবাসী আদিবাসী সম্প্রদায়। একে বলা হয় Kolarian festival (S.C. Roy, 1925) যেমন,— (ক) ভাদ্রমাসে এরা কর্মা একাদশী পরব পালন করে। একটি বা তার বেশি করম পাতা মাথায় সুন্দরভাবে গুঁজে নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে নাচতে বাসস্থানের নিকটেরর কোনও জলাশয়ে এরা জলকেলি করে, অর্থাৎ জলে নেমে জল ছিটিয়ে সকলকে ভিজিয়ে দিয়ে আনন্দে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। করম গাছ হল কদম গাছ। আমাদের পৌরাণিক কৃষ্ণলীলাতে এর পরিচিতি প্রচুর। আদিবাসীদের মিলন লীলার প্রতীকও কদম গাছ। তার জন্য তারা তাদের টাঙ্গাতে কদম গাছের ডাল পুঁতে তার চারিদিক ঘিরে ঘিরে নাচ গান করতে থাকে। কদম ফুল গাছকে অবলম্বন করে ওদের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার কোনও যোগসূত্র আছে কিনা জানি না।

গঙ্গাজল বা পবিত্র জল ছিটানো। পবিত্র জল যেখানে যেখানে ছিটানো হয়, সেখানের সব কিছুই শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে এরা জল ছিটিয়ে আবাসনের সব দোষ কাটিয়ে কোনও পবিত্র কাজের পূর্বে আমাদের এই সভ্যজগতের মধ্যে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র ও শুদ্ধ করে নেবার এই পদ্ধতি আদিবাসী সমাজ থেকে সভ্য সমাজে এসেছে বলে আমার মনে হয়। এই সময় আদিবাসী ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলা মেশা করে, নেচে গেয়ে পরবের কদিন আনন্দ করে তাকে।

ভাদ্রমাস, ভরা বর্ষার মাস। এই সময় বীরহোর সম্প্রদায়ের জঙ্গলে যাওয়া অত্যন্ত শক্ত হয়ে ওঠে। ফলে তাদের ঘর থাকে খাদ্যশূন্য। কিন্তু খালি পেটে থাকা সত্ত্বেও এদের মনের আনন্দে ভাঁটা পড়ে না। কোনও কোনও অঞ্চলে এই পরব একমাস চলে।

(খ) করম পরবের বারোদিন পর মহিলাদের জিতিয়া উৎসব। এই পরবটি বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী পালন করে থাকে। বীরহোরদের মধ্যেও সকলে নয়, কিছু কিছু বীরহোর টান্ডায় এই পরবটি অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। ডুমুরগাছের ডাল এবং কিছু ঘাস নিয়ে সারারাত বাজনার সঙ্গে নাচগান করতে থাকে এরা।

(গ) নদীমাতৃক এই ভারতের পূর্ব এবং মধ্য ভারত মকর সংক্রান্তির দিনকে এক পুণ্য দিন বিচার করে উৎসব পালন করে। এই দিনে গান - বাজনা করতে করতে নদীতে গিয়ে স্নান করা, চাল ও মাড়ুয়া পিষে পিঠা তৈরি করা ইত্যাদি আনন্দ নিয়ে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দেয়।

(ঘ) শীতের শেষে জঙ্গলে জঙ্গলে শাল মহুয়ার গায়ে গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরতে শুরু হয়। বসন্তের আগমনে সমস্ত পৃথিবী হাসতে থাকে যেন। তখন প্রকৃতির সন্তান এই আদিবাসীদের হৃদয়েও আনন্দের বাণ ডাকে। তারাও প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যাবার উৎসবে নেচে ওঠে। এই উৎসবকে বলা হয় ‘‘বা’’ পরব। অতি প্রাচীনকাল হতে এটা চলে আসছে। হো, মুন্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পরব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করলেও কিছু কিছু বীরহোর টাণ্ডায় এই পরব পালিত হয় আজও বসন্তে যখন ছোটনাগপুরের আকাশ বাতাস মহুয়া ও সাল পুলের সৌরভে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, তখন নূতন বৎসর আগমনের শুভকামনায় এখানকার। আদিবাসীরা সুরহুল উৎসবে মেতে উঠে।

সুরহুল উৎসবের পিছনে একটি ঐতিহাসিক সত্য কাহিনি আছে। এটি যদিও বিহারে সুপ্রচলিত, কিন্তু কৈশোরে কোনও এক সুরহুল পরবে এক ওরাওঁ বন্ধু ফিলুসের বাড়িতে গিয়ে তার মুখেই আমি শুনেছিলাম। পাঠানরা যখন ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করছে, তখন তারা বিহারের রোটার্স দুর্গ অধিকার করতে গিয়ে আদিবাসী সৈন্যদের বীরত্বের জন্য বারবার প্রতিহত হয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। সেই সময় এক সাধু - মহারাজের কথায় তারা জানতে পারে যে বসন্তের আগমনে সুরহুল পরব উৎসবে আকণ্ঠ হাড়িয়া (পচা ভাতের মদ) খেয়ে এরা নাচ গান করতে করতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে। সেই দুর্বল মুহূর্তকে পাঠান সেনাপতি বেছে নিয়ে রাতের অন্ধকারে আকস্মিক আক্রমণ করবে বলে নদীতীকে সৈন্য সমাবেশ করছিল। আদিবাসী সমাজে নারীরাও পুরুষের সমতালেই আমোদ - প্রমোদ - আনন্দে ভাগ নেয়। তারা পুরুষের তুলনায় মাত্রা রেখে হাড়িয়া বা মদ সেদিন খেয়েছিল। তার জন্য সংসারিক প্রয়োজনে পানীয় জল সংগ্রহের জন্য কয়েকজন নারীর মিলিতভাবে গাগরী নিয়ে নদীকূলে গিয়ে সৈন্য সমাবেশ দেখে পরিস্থিতি বুঝতে পারে। তারা তুরন্ত দুর্গে ফিরে গিয়ে প্রথমে পুরুষদের সজাগ করতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হল। এই সংকটময় পরিস্থিতির মেয়েরা কিন্তু হাল ছাড়ল না। তারা নিজেরা পুরুষদের যোদ্ধ পোশাকে সজ্জিত হয়ে তীর ধনুক ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুর্গের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে পাহারা দিতে থাকে। এদিকে দূরে নিচ থেকে পাঠান সৈন্যগণ এই অগণিত সজাগ সৈন্যদের টহলদারি করতে দেখে নিরাপদ দূরত্ব থেকেই প্রস্থান করে। এই সত্যকাহিনী গেজেটেও উঠেছে। সেই হতে নারীদের দ্বারা দুর্গা রক্ষার সম্মানে সুরহুল উৎসবে প্রতি বারো বৎসর অন্তর আদিবাসী মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরে তীর-ধনুক, লাঠি - সোটা নিয়ে সারাদিন বাড়ির বাইরে শিকারের উৎসবে মেতে ওঠে। সেদিন এদের চলার পথে ছাগল, মুরগি ইত্যাদি যা পায় শিকার করে এনে রাত্রে রান্না করে খায় এবং বাজনার তালে তালে নাচগান করে সারা রাত আনন্দ করে। এই বিষয়ে এই দিনে এদের কোনও আইনের বাধা থাকে না। নিজেদের সামন নিজেরা সামলাও। এই গানের মাধ্যমে তারাই প্রকাশ করে। সুরহুলের ‘‘বারে বৎসরে জেনী উৎসব মেয়েদের উৎসব’’। জানানা শব্দের অর্থ অন্তঃপুরবাসিনী অর্থাৎ মহিলা, এর থেকে জেনানা > জেনী।

আদিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে পাহাড়, গাছ, নদী নিয়ে নাচগান হত। এভাবেই প্রকৃতির পুজো করে এরা। এরা অনেক

পরে এদের মধ্যে পূজারী প্রথা এসেছে। পরে কৃষি এদের জীবনে মুখ্য স্থান করে নিয়েছে। ফলে দেখা যায় আদিবাসীদের মধ্যে সম্প্রদায় কৃষিকাজ জানে না, তারজন্য প্রতিদিন তারা কজঙ্গলে গেলে তাদের খাদ্য আসে। জঙ্গলের মাহাত্ম্য এই জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচুর। শীত গেলে আসে বসন্ত। তাই বসন্ত পূর্ণিমাতে এরা নাচ - গান, উৎসবের মধ্যে দিয়ে জঙ্গল পরিক্রমা করে ও শিকার করে। বর্তমান যুগে সরকারি আইনের কারনে শিকার ত্যাগ করলেও জঙ্গলের ফুল ও তার রেণু মেখে তারা হোলি উৎসব পালন করে। এদের মধ্যে রঙ বা আবীরের ব্যবহার নেই, আছে নাচ আর গান। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় আজ সভ্যজগতের সংস্পর্শে এসে আবীর ও রঙ নিয়ে মেতে উঠলেও এদের চিরাচরিত গান আর নাচ আজও ওদের প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

শরতের শেষে সমগ্র দেশ যখন দীপাবলী উৎসবে মেতে ওঠে, সমগ্র আদিবাসী সমাজ তখন সোহরাই উৎসবের গানে নাচে মাতোয়ারা হয়ে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দেয়।

সমাজের বিবর্তনে সঙ্গে আদিবাসী সমাজের মধ্যে বহু বহিরাগত উৎসব এসে মিশেছে। যদিও তা সব গোষ্ঠী সমানভাবে পালন করে না। যে স্থানে তারা বাস করে অর্থাৎ স্থানীয় প্রভাব যে গোষ্ঠীর উপর যেমন পড়েছে, তার প্রভাব অনুসারে এদের আচার - অনুষ্ঠানে পার্থক্য এসে গেছে। আবার বহু হিন্দু দেবদেবী এদের ধর্মে স্থান করে নিয়েছে। সে সব নিয়ে বহু গল্প - উপকথা আছে প্রচলিত হয়েছে। যেমন, করমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইঁদ, ছাতা; আবার বাঁধনার সঙ্গে বিঁধা পরব যুক্ত হয়েছে। যেহেতু শিব শস্যের আর কৃষির দেবতা, তারজন্য তাঁর সঙ্গে মনসা, শীতলা, বড়াম - এর মতো বহু দেবদেবী তাদের ধর্মের অনুপ্রবেশ করেছে।

মানভূমির লাগোয় পশ্চিমবঙ্গ হওয়াতে এখানের লোক - উৎসবের প্রভাব এদের আচরণে খুব বেশি দেখা যায়। সেই তুলনায় রাঁচী বা হাজারিবাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃষিজীবী মানুষের উৎসব কম পাওয়া যায়। মানভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ পূজা যে দুর্গাপূজা, তার অপেক্ষা মনসা পূজার জাঁকজমক এখানে বেশি দেখা যায় এবং এই পুজা এখানে তিন - চার দিন ধরে চলতে থাকে। তখন এখানকার মানুষজন নতুন কাপড় পড়ে আনন্দ করে। ফলে এখানে কে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, কে নয়, তা বোঝা যায় না।

দ্বিতীয় — আদিবাসীরা আসলে প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির সন্তান - ধারিত্রী মায়ের আদিম জনগোষ্ঠী। এদের ভগবান ''বোঙ্গা', একজন ভূত বা Spirit এবং যিনি এদের Supreme God, তাঁকে এরা ''সিংবোঙ্গা'' বলে থাকে। সিংবোঙ্গা আসলে সূর্যদেবতা এবং এই দেবতা তাদের সকল বিপদ - আপদ থেকে রক্ষা করে চলেছেন বলে এদের বিশ্বাস। এরা হাড়িয়া এবং সাদা মুর্গি বলি দিয়ে এই দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করে। তাছাড়া প্রকৃতির পাহাড় পর্বত, আকাশ ও নদী এদের উপাস্য দেবতা। গোমো স্টেশন থেকে বরখানা যেতে যে লুপলাই আছে, সেখানের একটি স্টেশন হচ্ছে 'দানিয়া'। এই স্টেশনের একদিন 'লুগু' অন্যদিকে 'ঝুমারা' পর্বত শৃঙ্গ। সুগু পর্বত আদিবাসীদের একটি শ্রেষ্ঠ দেবতা বা মূল বোঙ্গা। প্রতি বর্ষাতে এখানের জঙ্গলে এরা এনেস নাচগান করে শিকার করে এই লুগু বোঙ্গার পুজো দেয়। আর অন্য সকল পাহাড় তাদের কাছে বুরু বোঙ্গা।

(গ) প্রতি গ্রীষ্মে এরা 'সো সো' বোঙ্গার পুজো করে। কার্তিক মাসের হেমন্ত ঋতুতে ''দেসাই ও সেবাই'' ভাগবানের পুজো দেয় এবং এই পুজোতে গোত্রানুসারে বহু বীরহোর গোষ্ঠীও এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। গোত্রের কারণে একই টাণ্ডার কিছু পরিবার এই পুজোতে অংশ নিতে পারে, কেউ কেউ বাদ যায়। কিন্তু আনন্দ - বিনোদন সবার।

এই জনগোষ্ঠী সমাজে এদের কত প্রকার যে বোঙা তা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে হিন্দু সমাজেও তো অগুন্তি দেবদেবীর অবস্থান। প্রতিটি টাণ্ডায় আলাদা আলাদা বোঙ্গা থাকে। তখন তারা স্থান পরিবর্তন করে, তখন বোঙ্গাকে নিয়ে গিয়ে নতুন স্থানের মাটিতে পুঁতে রাখে। এদের সব অনুষ্ঠানে মুর্গি, খাসি বা শূকর বলি দিয়ে পুজো করে, তারপর বাজনার সঙ্গে নাচ-গান শুরু হয়। অন্যদিকে বলির মাংস রান্না হলে সেই মাংস সহযোগে তাদের ভোজনপর্ব সমাধা করে। খাওয়া আর আরম্ভের পূর্বে ভগবানকে সেই খাদ্য অর্পণ করে তারপর তারা গ্রহণ করে।

তৃতীয় —এদের পারিবারিক অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলে বোঝা সম্ভব নয় যে এরা যৌথভাবে কেমন করে আনন্দ করতে পারে! দু - তিনটি টাণ্ডার মেয়ে পুরুষ মিলিতভাবে হাড়িয়া (ভাত পচিয়ে তৈরি মদ) খেয়ে বাজনার সঙ্গে সারাদিন নাচ - গান করে। যাতে বাড়ির মালিকের উপর কোনও চাপ না পড়ে, তার জন্য এরা প্রত্যেকে নিজেদের চাল নিয়ে আসে। রন্ধন - ভোজন একত্রেই হয়। আর সারাদিন চলে আনন্দ মুখর নাচ, গান আর বাজনা; তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভরে হাড়িয়া পান করা। সকলের একত্রে এই যে আনন্দে আপ্লুত যৌথ বিনোদনের চিত্র অপূর্ব। এরই মধ্যে চলতে থাকে নানা রকম হাসি - মসক্‌রা ও কৌতুক। ঘরে ছেলের জন্ম হলেও এইরকম আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে এরা।

চতুর্থ —জঙ্গলের জীবনে জন্মের প্রাক্কাল হতে আদিম মানব সন্তানকে নানা প্রতিকূল বৈবীতার সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়েছিল। বহু বৎসরের বিবর্তনেও এই জনজাতির জীবন হতে যুদ্ধের মাদকতা দুর হয়ে যে যায়নি, তা তাদের কার্তিকী পূর্ণিমার উৎসবে মুরমার প্রান্তরে উপস্থিত থাকলে অনুভব করা যায়। রাঁচী হতে বারো মাইল দূরে মুরমার উঁচু প্রান্তর। এই উৎসবের দিনের নাচ এবং গান যুদ্ধোপযোগী উচ্চগ্রামে বাঁধা। ওরাওঁ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক গ্রামের আখড়াতে এই উৎসবের দিন চার পাঁচ - গ্রাম (বাপাড়ঢ়া) থেকে একের পর এক দল মুরমার প্রান্তরের দিকে ঢাকের বাদ্যের তালে তালে পা তুলে তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলে। মুরমার প্রান্তরে চড়বার সীমান্তে এসে এরা থেমে যায়। যখন চার - পাঁচ গ্রামের আখড়ার দল একের পর এক ওই প্রান্তরে চড়তে থাকে, তখন বেশ ভয় ভয় করতে থাকে। কারণ এই সময় কোনও গ্রাম আগে প্রান্তরে চড়বে। তার জন্য বেশ রেশারেশি চলে। প্রাচীনকালে রক্তাক্ত সংগ্রামে এর পরিণতি দেখা যেত। কিন্তু বর্ধমানে সরকারি বিধিনিষেধের কড়া বেড়াজালে এই প্রান্তরে লড়াই বন্ধ হয়ে গেছে।

পঞ্চম,— গোমিয়াতে থাকাকালীন প্রতি দুর্গা পুজার দশমীর দিন দেখেছি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা ময়ুর পুচ্ছে সজ্জিত

হয়ে নাচতে নাচতে পূজা মণ্ডপে আসছে। তাদের সঙ্গে কখনও কখনও আলাপন দ্বারা অঙ্কিত সজ্জিত হাতির মিছিলও এসেছে। ঢাক - ঢোল- মাদল - বাঁশি ও বড় বড় করতাল বাজিয়ে গান করতে করতে দুর্গা মূর্তির সামনে এরা বেশ কিছুক্ষণ গান ও নাচ করে দেবীর সন্তুষ্টি ভিধান করে, তারপর চলে যেত। এইরূপ ছাড়া অনেক সময় দেশের রাজা, জমিদার বা ঠাকুর সাহেব অথবা কোনও রাজনৈতিক নেতা বিনোদনের জন্য এদের হাড়িয়া খাইয়ে নাচগানের ব্যবস্থা করলে এরা অতি আনন্দের সঙ্গে তা পালন করে থাকে। আবার দেখেছি রাঁচী শহরে শ্রমিকেরা কাজ শেষ করে আদিবাসী স্ত্রীলোক ও পুরুষ মজুরেরা কর্মক্লান্ত দিনাবসানে যখন পাখিদের মতো আপন কুলায় ফেরে, তখন তাদের সাদা আনন্দময় হৃদয় হতে স্বতোৎসারিত গান গাইতে গাইতে তারা পথ চলে। যেন তাদের জীবনে কোনও দুঃখ নেই, ক্লান্তি নেই। ভাবতে অবাক লাগে দিনের শেষে পরিশ্রান্ত দেহ, এই অবস্থান কী করে তে আনন্দ করে! এছাড়া যখন দূরদূরান্তে ট্রাক ভর্তি মাল নিয়ে যায়, তখন্য এদের গলায় গান শোনা যায়।

কৃষি-জীবনের কাজ ধান - কাটা, রোপন বা বীজ বপন করা, এই সকল কাজেও এরা গান না করে যেন থাকতে পারে না। নাচ - গান এদের জীবনের বিলাস নয়, নয় রুজিরুটি যোগানের অঙ্গ, এটা তাদের জীবনেরই একটা অঙ্গ—বিশ্ব প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এদের জীবনে যুক্ত হয়ে আছে। তাই বলা যায়, যেখানে যে বিনোদন, কান্নাকে দূরে হাটিয়ে দিয়ে এরা কেবল হাসতেই জানে।

আধুনিক জগতে লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত একটি বিষয়। এর জন্য বহু গবেষক হারিয়ে যাওয়া বহু বিনোদনকে জন সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আবার কেউ কেউ গবেষণার নাম করে নূতন নূতন করে সুর, ছন্দ যুক্ত করে জনসাধারণকে অধিক আকৃষ্ট করার প্রয়াস করেছেন। তাই অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন শহরের শিল্পীরা লোকসঙ্গীতে আধুনিকতার প্রলেপ দেওয়ায় এর লৌকিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডঃ সুধীর করণ তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে লিখেছেন, ''বলাবাহুল্য, এইসব অঞ্চল মুখ্যত আদিবাসী, প্রায় আদিবাসী, হিন্দুধর্মী আদিবাসী এবং অন্যান্য হিন্দুদের মিলনভূমি। এদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। এদের গাছে গাছে ভূত প্রেত দেবতার অধিষ্ঠান , গ্রামে গ্রামে ডাকিনী। অপদেবতার আক্রোশ এদের চিরসাথী। এদের ঢাক - ঢোল - নাগরা - ধুমসা - মাদলের বোল মেঘগর্জন। মনু নিষিদ্ধ গ্রাম - দেবতাদের সীমাহীন প্রভাবে প্রভাবিত এদের গ্রাম্যজীবন। নাচে - গানে চঞ্চল এদের জীবনযাত্রা। প্রাচীনতম সংস্কার এদের আচার অনুষ্ঠানে, বৈশিষ্ট্য এদের সংস্কৃতি, বিচিত্র এদের জীবনযাত্রার প্রকৃতি।'' (পৃষ্ঠা ২৫)

প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে সবকিছুই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নজর করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে এ বিষয়ে কিছু অনুশাসনের সীমা রেখার কথা উঠছে। যেমন অধ্যাপক অরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন যে— লোকসংস্কৃতির কোনও উপাদানে পরিবর্তন বা পরিমার্জনের অধিকার আমাদের নেই। অবিকৃত অবস্থাতে তাকে যে আমাদের সংগ্রহ করতে হবে, সেইভাবেই তাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু আজ বিশ্বায়নের যুগে এই সংগৃহীত বস্তুতেও নানা প্রয়োগের মাধ্যমে দিনের পর দিন এর দূরত্ব বেড়েই যাচ্ছে। মাননীয় চিত্তরঞ্জনদেব তাঁর রোগ শয্যায় আমাকে বলেছিলেন— ''জীবনে কত পরিশ্রম করে যে এইসব লোকতথা সংগ্রহ করেছি, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এগুলি সব লাইব্রেরীতে সাজানই থাকবে।''

ডারউইন তত্ত্ব অনুসারে সব কিছুর ক্রমপরিবর্তন আছে। কিছুই তার পরিবেশকে উপেক্ষা করতে পারে না। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় W.G. Archer এবং আরও অনেকের অভিমতের উল্লেখ করে এবং অনেকের অভিমতকে যুক্ত করে লিখেছেন যে ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁদিগের নৃত্য সম্বলিত সংগীত খুবই ক্ষুদ্রাকৃতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র চারটি পদযুক্ত। নাচবার সময় গানের চারটি পদ গেয়ে সামনের দিকে পা ফেলাকে তারা ''ত্তর'' বলে। শেষ পদ দুটি গেয়ে পিছিয়ে আসতে হয়, তাকে ''কীর্তন' বলে। ওরাওঁদের নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীতের বিশিষ্ট একটি অংশের নাম কীর্তন।

এর থেকে মনে করা হয় যে বাংলাতে একদিন 'কীর্তন' গান মূলত নৃত্যসম্বলিত লোকসঙ্গীত ছিল। পরে সাধকের সাধনায় তা উচ্চতর সঙ্গীত সাধনায় উন্নীত হয়েছে। এটাই হয়তো যুগধারা বা যুগের বিবর্তন ধারা।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা একথা স্বীকার করেন যে, ক্রমপরিবর্তন ধারার মধ্য দিয়েই লোক সাহিত্যের প্রাণশক্তি রক্ষা পায় পাচ্ছে বা পাবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি পরিবর্তিত রূপই সমাজ-মানস কর্তৃক স্বীকৃত। এরকম সবদিক বিচার করলে দেখা যায় যে, সমাজ বিশ্বায়নকে গ্রহণ করেছে। তার নগরায়ণের রূপটিও সম্ভবত নূতন নূতন ভাবধারাতে প্রভাবিত। ফলে প্রাচীন লোক - বিনোদনের পদ্ধতি আজ নূতন অলঙ্করণে ভূষিত হচ্ছে। তেমনই ভারতের মতো জঙ্গলের মানুষ আজও প্রাচীন জীবনচর্চা টেনে চলেছে। তার জন্য আজও এখনও সেখানে প্রাচীন পদ্ধতিতে নাচ-গান-বিনোদন হচ্ছে। কিন্তু উন্নত দেশের জঙ্গলের মানুষ যেখানে আধুনিক জীবনধারা গ্রহণ করেছে, সেখানে প্রাচীনের মধ্যে নূতন ধারা লক্ষ করা যায়। ফিনল্যান্ডের ক্যারেলিয়া বা ল্যাপ প্রদেশে এর বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ করেছি। তাই নতুনের মাঝে পুরাতনকে খুঁজে বের করতে নিতে হবে আজ। তার জন্যই আজকের প্রজন্ম (বা সব যুগের আধুনিক প্রজন্ম)-কে গভীরভাবে প্রাচীন তথা পুরাতনকে অধ্যয়ন করলেই তা সম্ভব হবে।